১৭ অক্টোবর ২০০৫ পনেরো টাকা

দেশ

আকাশের তারায় মহিষাসুরমর্দিনী

বিমান নাথ

এ ই স ম য়

বন্ধ নয়, মদতপুষ্ট সন্ত্রাস

ভারত-বাংলাদেশ জলবণ্টন সমস্যা

ভূমিসংস্কারের অন্য রূপ

রিয়েল এস্টেট: বড় ধুম লেগেছে

আর্সেনিক: ইতিহাস ক্ষমা করবে না

ফতোয়ার এত জোর!

পায়ে পায়ে বিদ্যুৎ

সৌরভ-গ্রেগই পারেন জেতাতে

পুরাণের গল্পগুলি কি নিছক গল্পকথা? অনেকে এর পেছনে পৌরাণিক যুগের মানুষের চিন্তাধারা বা বিজ্ঞানভাবনার যোগসূত্র খুঁজেছেন।

আকাশের তারায় মহিষাসুরমর্দিনী

বিমান নাথ

প্র ব ন্ধ

পুজোর আগে একদিকে কুমোর ঠাকুর গড়ছে আর অন্যদিকে পাঠশালায় নামতা পড়ছে ছেলেরা, 'এক এক্কে এক, দুই এক্কে দুই' — ছড়ার গানটি আমরা সবাই শুনেছি। ছেলেদের কি আর পড়ায় মন বসে? তারা নামতা পড়তে পড়তে ভাবছে, 'কে জানে এবার বুঝি সিংহরাজের কেশর দিল জুড়ে/ অসুর বোধহয় বেরিয়ে গেছে মোষের পেটটি ফুঁড়ে' দুর্গাঠাকুরের মূর্তির কোথায় কী আছে সেটা কি আর কারও নামতার মতন মুখস্থ করতে হয়? ছবিটা আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে।

মা দুর্গার এই ছবিটা, অর্থাৎ এই সিংহবাহিনী এবং মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিটা যে-কাহিনী অবলম্বনে গড়া হয়েছে, তাও আমাদের অজানা নয়। মহালয়ার ভোরে চণ্ডীপাঠ শুনতে শুনতে ঘুমমাখা চোখেই যেন আমরা পরিচিত দৃশ্যটি দেখতে পাই। সিংহের পিঠে চড়ে এক দেবী মহিষের রূপধারী এক অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। সেদিন থেকে দশমীর বিসর্জন পর্যন্ত এই ছবিটি আমাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকে। পুজোর হুল্লোড়ে অবশ্য এ নিয়ে খুব একটা ভাবার অবকাশ থাকে না।

পার্সিপোলিসের দেওয়ালে সিংহ কর্তৃক বৃষনিধনের মূর্তি। (ওপরে) কন্যা নক্ষত্রমণ্ডলী, দুর্গার মূর্তিকল্পনার উৎস?

কিন্তু যদি কোনও কারণে দুর্গাপুজোর প্রায় ছয়মাস আগে কেউ সন্ধ্যার আকাশটি লক্ষ করে দেখেন তবে আসন্ন পুজোর কথা ভেবে একটা চমক লাগতে পারে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হতে পারে যে, তিনি আকাশের তারার মধ্যে দেবী দুর্গার মহিষাসুরবধের দৃশ্য দেখছেন। সেই মদমত্ত বৃষের রক্তবর্ণ চোখ, তার মুখোমুখি এক বিশালকায় সিংহ, আর এক নারীমূর্তি, যার

হাতের কাছে রয়েছে নানান অস্ত্রশস্ত্র।

কথাটা একটু খুলে বলা যাক।

পুরাণের গল্পগুলি কি নিছক গল্পকথা, না তার পিছনে আরও কিছু রয়েছে—এমন একটি প্রশ্ন আমাদের মনে প্রায়ই জাগে। অনেকে পুরাণের গল্পকে ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিফলন ভাবেন— কেউ কেউ আবার অতি উৎসাহে এরিক ফন দানিকেনের মতো পুরাণের সব গল্পকেই কোনও একটি মহাকাশচারী সভ্যতার সঙ্গে জুড়ে দেন। আবার অনেকে গল্পগুলির পেছনে পৌরাণিক যুগের মানুষের চিন্তাধারা বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণার যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করেন।

১৯৬৫ সালে এমন একটি কথা বলে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন বিজ্ঞানের এক ইতিহাসবিদ। উইলি হার্টনার তখন ফ্রাঙ্কফুর্টের বিজ্ঞানের ইতিহাসের গবেষণা সংস্থার (Institute für Geschichte der Naturwissenschaften) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সে বছর 'জার্নাল অফ নিয়ার ইস্টার্ন স্টাডিজ'-এ একটি যুগান্তকারী প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটিতে তিনি মেসোপটেমিয়া থেকে পারস্য অবধি, প্রাচ্যের বিস্তৃত এলাকায় দেখতে পাওয়া যায় এমন একটি ছবির উল্লেখ করেন। ছবিটি হল একটি সিংহের সঙ্গে মহিষের যুদ্ধের। সুমের অঞ্চলে ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ নির্মিত বহু সিলমোহর এবং পাত্রের গায়ে যে ছবিটি খুব বেশি করে দেখা যায় সেটাও হল একটি সিংহের হাতে একটি মহিষের মৃত্যু। কিন্তু মেসোপটেমিয়া থেকে পাওয়া লেখায় (যেমন, গিলাগামেশের কাহিনি) এমন কোনও ঘটনার বা গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়নি যা এই বহু প্রচলিত ছবির উৎসে আলোকপাত করতে পারে। সুমেরীয় সভ্যতার গবেষকদের কাছে অনেক বছর ধরেই এটা একটা বড় রহস্য রয়ে গেছে।

শুধু সুমেরেই নয়, ঠিক এই ছবিটি পারস্যের প্রাচীন রাজধানী পার্সিপোলিসের প্রাসাদের দেওয়ালেও দেখা যায়। এই প্রাসাদ অবশ্য তৈরি হয়েছিল সুমেরীয় সভ্যতার পতনের অনেক পরে, প্রায় ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

এই বহু প্রচলিত ছবির উৎস নিয়ে নানান ধরনের ইতিহাসবিদদের মধ্যে অনেক বছর ধরে জল্পনাকল্পনা চলছিল, কিন্তু কেউই ভাল করে বুঝে উঠতে পারেননি। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৬৫ সালে হার্টনারের প্রবন্ধ এক নতুন ধরনের ভাবনার অবকাশ নিয়ে এল।

হার্টনার বললেন, ছবির সিংহ আর মহিষ হল আকাশের দুটি তারামণ্ডলী—সিংহ এবং বৃষ তারামণ্ডলী। মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই আকাশের তারাগুলিকে বিভিন্ন মণ্ডলীতে ভাগ করে তাদেরকে তার পরিচিত জিনিস বা জন্তুর আকারে কল্পনা করেছে। অনেক সময় তখনকার দিনের প্রচলিত গল্পের নায়ক-নায়িকাকেও এদের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। তাই হয়তো কোনও তারামণ্ডলীর নাম দেওয়া হয়েছে সিংহ, আবার অন্য একটির হয়তো নামকরণ হয়েছে মেষ বা বৃষ। যেমন বৃষ তারামণ্ডলীর সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা হল রোহিণী (Aldebaran)। পরিষ্কার আকাশে একে আমরা লাল রঙের দেখতে পাই। প্রাচীন মানুষ রোহিণীকে আকাশের কাল্পনিক মদমত্ত বৃষটির একটি রক্তবর্ণ চোখ বলে ভেবেছিল।

এদের মধ্যে কয়েকটি তারামণ্ডলী রয়েছে ঠিক যে পথে সূর্যকে বছরে একবার ঘুরে আসতে দেখা যায় তার ওপর। এই তারামণ্ডলীগুলিকে আমরা রাশিচক্রের এক একটি রাশি বলে চিনতে পারি— হার্টনারের সিংহ ও বৃষ তারামণ্ডলী হল আমাদের পরিচিত সিংহ ও বৃষ রাশির তারামণ্ডলী।

হার্টনারের কথাটা অনেকের কাছে সেই সময় নতুন ঠেকলেও, তাঁর আগেও একজন প্রায় এমনই একটা কথা বলেছিলেন। প্রসঙ্গটা একটু ভিন্ন হলেও আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। তাই সংক্ষেপে সেটা জেনে নিই। রোমানদের একজন দেবতার ইতিহাস নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। এই দেবতার নাম 'মিথ্র' (Mithra)। পাঠক-পাঠিকার মনে এই নামের সঙ্গে একটি ভারতীয় এমনকী একটি বাংলা শব্দের কথা মনে এলে সেটা হবে যথার্থ অনুমান। এই শব্দটি মূলত ইন্দো-ইউরোপিয়ান; এদেশে শব্দটির অর্থ 'বন্ধু'। প্রাচীন পারস্যে শব্দটির দুই অর্থ ছিল— বন্ধু এবং সূর্য। পরে এই শব্দটি 'মিহির' এবং 'মেহের' (যে নামটি বর্তমান পারসিদের মধ্যে খুব প্রচলিত এবং যার অর্থ হল আলো বা সূর্য) হয়েও দেখা দিয়েছে। আমাদের বেদেও অবশ্য বরুণ এবং মিথ্র দেবতাকে একসঙ্গে ভাবা হয়েছে।

প্রাচীন পারস্যের এই নামটি কীভাবে একজন রোমান দেবতার নাম হয়ে দাঁড়াল, সেটা আর এক বড় কাহিনি। শুধু তাই নয়, এই 'মিথ্র' দেবতার পুজোর নিয়মকানুন পরে খ্রিস্টধর্মেও ঢুকে পড়েছে। যেমন রবিবারে বিশেষ পুজোর নিয়ম। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের আগে এই দিনটিতে রবি অর্থাৎ সূর্য বা 'মিথ্র' দেবতার পুজো হত। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবি তাই 'মিথ্র-ধর্ম'কে 'ক্রুসিব্‌ল অফ ক্রিশ্চিয়ানিটি' আখ্যা দিয়েছিলেন।

হার্টনার বললেন, ছবির সিংহ আর মহিষ হল আকাশের দুটি তারামণ্ডলী—সিংহ এবং বৃষ তারামণ্ডলী। মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই আকাশের তারাগুলিকে বিভিন্ন মণ্ডলীতে ভাগ করে পরিচিত নানা রূপে কল্পনা করেছে।

হয়তো অনেকে এ পর্যন্ত পড়ে ভাবছেন, সবই বুঝলাম, কিন্তু আমাদের দুর্গাঠাকুরের সঙ্গে এই মিথ্র-দেবতার কী সম্পর্ক? যোগসূত্রটা হল ওই বৃষসংহার। মিথ্র-দেবতার মূর্তিতে তাঁকে একটি মহিষকে বধ করতে দেখা যায়। এই মূর্তির উৎস খুঁজতে ১৮৬৯ সালে কে বি স্টার্ক নামে এক জার্মান পণ্ডিত বলেন যে, হয়তো এই মূর্তির সঙ্গে আকাশের তারামণ্ডলীর কোনও যোগ রয়েছে। কিন্তু প্রায় একশো বছর তাঁর এই তত্ত্বকে কেউ পাত্তা দেননি। বছরের পর বছর সবাই মিলে সুমের এবং পারস্যের পৌরাণিক গল্পগুলির মধ্যে মহিষবধের উল্লেখ খুঁজে বেড়িয়েছেন। এবং যখন তেমন কোনও গল্প খুঁজে পাওয়া যায়নি, তখন পুরো 'মিথ্র-ধর্মে'র ব্যাপারটাই রহস্যময় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হার্টনারের ১৯৬৫ সালে লেখা প্রবন্ধটি পড়ে অনেকেরই স্টার্ক

সুমের অঞ্চলে ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ নির্মিত বহু সিলমোহর এবং পাত্রের গায়ে যে ছবিটি খুব বেশি করে দেখা যায় সেটাও হল একটি সিংহের হাতে একটি মহিষের মৃত্যু।

সাহেবের পুরনো কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। এর পর অনেকেই পৌরাণিক গল্পের, বিশেষ করে ছবি বা মূর্তির উৎস খুঁজতে আকাশের দিকে তাকিয়েছেন। কেউ কেউ শুধু প্রাচীন মূর্তিগুলিতে আকাশের তারামণ্ডলীর অবস্থানের প্রতিফলন দেখেই ক্ষান্ত হননি। কয়েকজন এমন কথাও বলেছেন যে এমন মূর্তি বা ছবি বা পৌরাণিক গল্পের মধ্য দিয়ে প্রাচীন যুগের মানুষ তাঁদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কথা বলার চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে যে বইটি সবচেয়ে বিতর্কিত সেটা হল জিয়োর্জিও দ্য সান্তিয়ানা (Giorgio de Santillana) এবং হার্থা ফন ডেখেন্ড

এবারে বছরের সেই দিনটির কথা ভাবা যাক যেদিন বৃষ তারামণ্ডলীকে শেষবারের মতো সূর্যাস্তের পরেপরেই আকাশের পশ্চিম দিগন্তে দেখা যায়। শেষবারের মতো, কারণ এর পরের দিন এই তারামণ্ডলীকে কিছুক্ষণ আগে অস্ত যেতে দেখা যাবে, অর্থাৎ যখন সূর্য পুরোপুরি অস্ত যায়নি। সূর্যের আলোর ছটায় তাকে আর এর পরের দিন দেখা যাবে না। হার্টনারের মতে প্রাচীন মানুষ এই ঘটনাকে বৃষ তারামণ্ডলীর 'মৃত্যু' বলে কল্পনা করেছিল।

এবারে বৃষ তারামণ্ডলীর সন্ধ্যাকাশে শেষবারের মতো অস্ত যাবার মুহূর্তে যদি কেউ মাথার ওপর তাকান, তাহলে সেখানে

সন্ধ্যাকাশে শেষবারের মতো বৃষ তারামণ্ডলীর অস্ত যাবার মুহূর্তে যদি কেউ মাথার ওপর তাকান, তাহলে সেখানে দেখতে পাবেন সিংহ তারামণ্ডলীকে। এমনও মনে হতে পারে যে, এই সিংহটিই যেন বৃষটিকে 'মৃত্যুর' মুখে ফেলে দিচ্ছে।

(Hertha von Dechend)-এর ১৯৬৯ সালে লেখা 'হ্যামলেট'স মিল—অ্যান এসে অন নলেজ অ্যান্ড ইটস ট্রান্সমিশন থ্রু মিথস'। তাঁদের মতে প্রাচীন সভ্যতার মানুষ জ্যোতির্বিদ্যায় অনেক উন্নত ছিল এবং নানান গল্পের মধ্য দিয়ে তারা তাদের আবিষ্কারগুলির কথা বলবার চেষ্টা করেছে। এখনও বইটির বক্তব্য নিয়ে গবেষকদের মধ্যে প্রায় হাতাহাতি লেগে যায়। ১৯৮৯ সালে ডেভিড উলানসে-র লেখা 'দ্য অরিজিনস অফ দ্য মিথ্রাইক মিস্ট্রিজ' বইটির উপপাদ্যও একই।

হার্টনার অবশ্য তাঁর প্রবন্ধের প্রথমেই স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে, তিনি প্রাচীন সভ্যতাগুলিকে উন্নত বলে দাবি করছেন না। তাঁর বক্তব্য শুধু এই যে, প্রাচীন মানুষ আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু কল্পনা করেছিল এবং কখনও কখনও পৌরাণিক গল্পে তার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রাচীন সুমেরের লোকজন যে আকাশের তারাগুলিকে বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক এমন কয়েকটি তারামণ্ডলীতে ভাগ করেছিল, তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে এবং সেটা নিয়ে বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদদের মধ্যে কোনও বিশেষ মতানৈক্য নেই। প্রাচীন সভ্যতায় এর বেশি কোনও গূঢ় বিদ্যার কথা হার্টনার বলেননি।

এবার হার্টনারের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। আমরা জেনেছি যে, তিনি সিংহের মহিষবধের ছবির সঙ্গে আকাশের সিংহ ও বৃষ রাশির যোগ খুঁজে পেয়েছিলেন। তা না হয় হল, কিন্তু সিংহটি মহিষকে বধ করছে কেন? হার্টনারের ব্যাখ্যাটি বোঝার চেষ্টা করা যাক।

সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য আমাদের আকাশের তারাগুলির অবস্থান প্রতি রাতে বদলায়। আজ যদি (স্থানীয় সময়) রাত ন'টায় কোনও বিশেষ নক্ষত্রকে অস্ত যেতে দেখা যায়, তাহলে পরদিন তাকে রাত ৮টা ৫৬ মিনিটে অস্ত যেতে দেখা যাবে। পনের দিন পর নক্ষত্রটি রাত্রি আটটার সময়, এবং এক মাস পর সন্ধে সাতটার সময় অস্ত যাবে। এভাবে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরে এক বছর পর আবার একই সময়ে তাকে অস্ত যেতে দেখা যাবে।

দেখতে পাবেন সিংহ তারামণ্ডলীকে। এমনও মনে হতে পারে যে, এই সিংহটিই যেন বৃষটিকে 'মৃত্যুর' মুখে ফেলে দিচ্ছে। হার্টনারের ভাষায়, সিংহ তারামণ্ডলী তখন ছিল মাথার ঠিক ওপরে, যেন সে তার শক্তিমত্তার তুঙ্গে এবং যেন সে দিগন্তের নীচে পলায়মান মহিষটিকে বধ করতে উদ্যত। হার্টনারের মতে আকাশে সিংহ ও বৃষ তারামণ্ডলীর এই বিশেষ অবস্থানকে প্রাচীন যুগের মানুষ কল্পনা করেছে সিংহের বৃষসংহার বলে।

অনেকের মনে হতে পারে যে, আকাশে তো মেষ, কর্কট বা আরও অনেক তারামণ্ডলীই রয়েছে। তাদের প্রত্যেকটির জন্যও এমন এক একটি 'মৃত্যু'র ঘটনা কল্পনা করা যেতে পারে, কারণ বছরের কোনও না কোনও দিন সেগুলিও শেষবারের মতো সন্ধ্যাকাশে অস্ত যাবে। শুধু বৃষ তারামণ্ডলী নিয়ে এত হইচই কেন?

হার্টনার তার উত্তরে বলেছেন যে, সুমেরীয় সভ্যতার প্রথম দিকে (অর্থাৎ প্রায় ৪০০০-৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) বৃষ তারামণ্ডলীর 'মৃত্যু' হত বছরের একটি বিশেষ সময়ে, যার জন্য এই ঘটনাকে সবাই মনে রেখেছে, বা পরে মূর্তি বানানো হয়েছে। তখন এই ঘটনাটি ঘটত শীতের শেষে, শস্যবপনের সময়। হার্টনারের মতে সুমেরীয়দের কাছে সিংহের বৃষসংহার এক নতুন কৃষি-বছরের প্রতীক ছিল।

কিন্তু পরবর্তীকালে বৃষের এই 'মৃত্যুর' সময়টা ধীরে ধীরে বদলে যায়। এর কারণ হল পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতি ছাড়াও আর একটি গতি রয়েছে, যা আমরা সহজে টের পাই না। একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে। একটা লাটিমকে যদি ঘোরানো হয়, তখন প্রথমে তাকে তার 'অক্ষরেখা'র চারিদিকে ঘুরতে দেখা যাবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে যে, তার অক্ষরেখাটিও নিজেই ধীরে ধীরে পাক খাচ্ছে। এর কারণ হল পৃথিবীর মহাকর্ষণ। এবার পৃথিবীকে একটি লাটিমের মতো ভাবা যাক যে তার অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরছে। এক্ষেত্রেও সূর্যের মহাকর্ষণের জন্য পৃথিবীর অক্ষরেখাটি নিজেই

ধীরে ধীরে পাক খাবে। তবে খুব ধীরে। এত ধীরে যে একবার ঘুরে আসতে তার সময় লাগে প্রায় ছাব্বিশ হাজার বছর। এমন একটি সূক্ষ্ম গতি সহজে ধরা পড়ার কথা নয়, এবং এই তথ্য ১২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক বিজ্ঞানী হিপারকাস আবিষ্কার করেছিলেন।

পৃথিবীর অক্ষরেখার এই আলাদা করে ঘোরার জন্য আকাশের তারাগুলির অবস্থান একটু একটু করে বদলে যায়। তাদের অস্ত বা উদয়ের সময়ও যায় পালটে। হার্টনার অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন যে, প্রায় ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এসে বৃষ তারামণ্ডলীর 'মৃত্যু'র সময়টা মাসখানেক পিছিয়ে যায় মোটামুটি এখনকার মার্চ মাসের শেষের দিকে, অর্থাৎ যখন দিন আর রাত প্রায় একই দৈর্ঘ্যের হয়। এটাও বছরের একটা বিশেষ সময়।

এদিকে পারস্যের প্রাচীন রাজবংশের শুরুও হয়েছিল প্রায় ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এবং তাঁরা এই সময়টিকেই নতুন বছরের শুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন। তাই হার্টনারের মতে সুমেরের পুরনো বৃষসংহারের মূর্তি পারস্যেও বহাল রইল, যদিও খানিকটা অন্য কারণে। আর সেই জন্যে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বানানো পার্সিপোলিসের প্রাসাদে সিংহের বৃষসংহারের ছবির ছড়াছড়ি। শুধু তাই নয়, পারস্যের অধীন টার্সুস নামে একটি শহরে এই ছবি আঁকা মুদ্রাও পাওয়া গেছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে স্বাভাবিক ভাবে একটা প্রশ্ন জাগে। সিংহের সঙ্গে বৃষের যুদ্ধ ও শেষ পর্যন্ত বৃষের মৃত্যুর ঘটনা আমাদের খুব পরিচিত। অবশ্য শুধু সিংহ নয়, আমাদের কাহিনিতে দুর্গা সিংহের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন। এবং শুধু মহিষ নয়, মহিষরূপী এক অসুরকে বধ করেন। মিথ্র-দেবতার মূর্তির উৎস অনুসন্ধানে গবেষকরা যেমন তাকে আকাশের তারা-মানচিত্রের এক প্রতিফলন হিসাবে কল্পনা করেছেন, আমরা যদি মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তির ক্ষেত্রেও সেই চেষ্টা করি তাহলে খুব একটা হতাশ হব না।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, দেবী দুর্গার ধারণাটি যে পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতে এসেছে তার কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণও রয়েছে। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শক্তির রূপ : ভারতে ও মধ্য এশিয়ায়' বইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে পাওয়া এমন কয়েকটি মুদ্রার কথা আলোচনা করেছেন যেসব প্রমাণ করে যে, দুর্গার ধারণা ও ধর্মানুষ্ঠান পশ্চিম এশিয়া থেকে এসেছে। তাঁর মতে খ্রিস্টের জন্মের কয়েকশো বছর আগে পশ্চিম এশিয়াতে প্রচলিত এক ধরনের মাতৃপূজার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন সেই দেবীর বাহন ছিল সিংহ এবং দেবীকর্তৃক অশুভশক্তির বিনাশকে ঘিরে পুজা হত। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পর ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে গ্রিক, শক, পহ্লব ও কুষাণ রাজাদের শাসনকালেই হয়তো এইসব ধারণা পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতে আসে—কারণ এই সময় পারস্যের কিছু অংশ ও ভারতীয় মহাদেশের কিছু অঞ্চল একই ধরনের রাজনৈতিক শক্তির অধীন ছিল।

এবারে বৃষ তারামণ্ডলী যখন অস্তপ্রায় আর সিংহরাশি যখন মাথার ওপরে, তখন যদি হার্টনারের মতো আমরা আকাশের দিকে একবার তাকাই, তা হলে সিংহের পাশেই দেখতে পাব এক নারীমূর্তি, যাকে এখন আমরা কন্যা তারামণ্ডলী বলে জানি। এখানে উল্লেখ্য, শশিভূষণ দাশগুপ্তের লেখা 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' বইতে আলোচিত একটি মত অনুযায়ী পশ্চিম এশিয়ার এক দেবী 'ব্যাইর্গো'-র (Virgo) পুজো থেকেই দুর্গার পুজোর উৎপত্তি। বলা বাহুল্য যে এই 'ব্যাইর্গো' দেবীই আকাশে Virgo বা কন্যারাশির সঙ্গে যুক্ত।

শুধু তাই নয়, এই নারীমূর্তির কাছেই কিছু চমকপ্রদ তারামণ্ডলী রয়েছে। যেমন 'বুটিস' (Bootes) তারামণ্ডলী, যার আকার একটি গদার মতো, রয়েছে চক্রের সঙ্গে তুলনীয় 'করোনা বোরিয়ালিস' (Corona Borealis)। অন্যদিকে রয়েছে সর্পাকৃতি হাইড্রা (Hydra, জলসর্প)। আরও দেখতে পাব, বৃষের কাছেই রয়েছে একটি উজ্জ্বল তারামণ্ডলী, যাকে গ্রিক পুরাণের ওরিয়ন (Orion) নামের এক অশান্ত শিকারি রূপে কল্পনা করা হয়েছে। আর তার 'কোমর'-এর কাছে রয়েছে তিনটি উজ্জ্বল তারা, যেগুলোকে একটি কাল্পনিক ত্রিশূলের ক্ষতচিহ্ন বলে ভাবা যেতে পারে। বৃষ তারামণ্ডলীর এত কাছে নররূপী এই তারামণ্ডলী আসলে কার প্রতীক?

গ্রিক পুরাণে ওরিয়নের জন্মকথা শুনলে সত্যি চমক লাগে। কিংবদন্তি অনুযায়ী তার জন্ম হয়েছিল একটি মহিষ থেকে। কাহিনিটা এই রকম : হাইরিউস (Hyrieus) নামে এক মেষপালকের বাড়িতে একদিন তিন দেবতা এসেছিলেন—জিউস, হার্মিস এবং পসাইডন। এঁরা আসায় সে এত খুশি হয়েছিল যে সে তার একমাত্র মহিষকে মেরে দেবতাদের খেতে দিয়েছিল। দেবতারা খুশি হয়ে তাকে একটি বরদান করতে চাইলে হাইরিউস একটি পুত্র কামনা করল। তখন দেবতারা তাকে সেই মহিষটির ত্বক মাটিতে পুঁতে রাখতে বললেন। নয় মাস পর সেই জায়গায় একটি ছেলের জন্ম হল, এবং সেই হল ওরিয়ন।

এই তারামণ্ডলীই কি তা হলে মহিষাসুরের কাহিনির উৎস? এমনটি কল্পনা করা খুব কঠিন নয়। তবে ওরিয়ন তারামণ্ডলী নিয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। আসলে এই তারামণ্ডলীর মধ্যে এবং তার আশেপাশে বেশ কয়েকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র রয়েছে। তাই এটি সকলের নজর কাড়ে। একে জড়িয়ে নানারকম কল্পকাহিনির প্রচলনও তাই অপ্রত্যাশিত নয়। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁর ১৮৯৩ সালে লেখা 'দ্য ওরিয়ন' বইতে এই তারামণ্ডলীকে হিন্দু ধর্মের অনেক পৌরাণিক কাহিনি এমনকী নিয়মকানুনের উৎস বলে ভেবেছেন। তাঁর মতে 'ওরিয়ন' তারামণ্ডলীকে বৈদিক ঋষিরা একাধারে প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব বা রুদ্রের প্রতীক বলে কল্পনা করেছিলেন। একসময় একে একজন মৃগব্যাধ বলেও ভাবা হয়েছিল, যার 'হাত'-এর কাছে

সেন যুগের একটি মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি

শশিভূষণ দাশগুপ্তের লেখা 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' বইতে আলোচিত একটি মত অনুযায়ী পশ্চিম এশিয়ার এক দেবী 'ব্যাইর্গো'-র (Virgo) পুজো থেকেই দুর্গার পুজোর উৎপত্তি।

রয়েছে মৃগশিরা নক্ষত্র। আবার কখনও ওরিয়নকেই একটি হরিণের মাথা বলে ভাবা হয়েছে—সেক্ষেত্রে মৃগশিরা ছিল একটি তারামণ্ডলী, শুধু একটি নক্ষত্র নয়।

তিলকের মতে প্রাচীন যুগের এই ধরনের কল্পনা ছিল দ্বিমুখী। একদিকে এই কল্পনা লোকমুখে প্রচলিত কাহিনিগুলিকে আকাশের তারার জগতে নিয়ে গেছে, অন্যদিকে আকাশে তারার অবস্থান থেকে প্রাচীন মানুষ কাহিনি বা নিয়ম রচনা করেছে। এই ধরনের প্রভাবের উদাহরণ হিসেবে তিনি ওরিয়নকে প্রজাপতি ব্রহ্মা বলে ভাবার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই তারামণ্ডলীকে যখন প্রজাপতি বা প্রথম ব্রাহ্মণ হিসাবে ভাবা হয়েছিল, তখন তার কোমরের তিনটি উজ্জ্বল তারাকে একটি কোমরবন্ধের সঙ্গে তুলনা করে ঋষিদের মধ্যে উপবীত পরার রীতি এল। যেহেতু তারামণ্ডলীর কোমরে তিনটি তারা রয়েছে, তাই উপবীতকে তিনবার ভাঁজ করে পরার রীতি। (বিশদ ব্যাখ্যার জন্য তিলকের বইটি দ্রষ্টব্য।)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মৃগশিরা এবং এর মতন আরও কিছু নক্ষত্রের প্রাচীন নাম যে আকাশের ঠিক কোন তারার সঙ্গে জড়িত তা নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। অনেকে মৃগশিরাকে ভাবেন ওরিয়ন-এর কোমরের তিনটি তারার মধ্যে একটি, আবার অনেকে একে আকাশের অন্য অংশে খুঁজেছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে ওতপ্রোত 'ওরিয়ন'

ওরিয়ন নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। মাইকেল স্পিডেল (Michael Speidel) তাঁর ১৯৮১ সালে লেখা 'মিথ্রজ ওরিয়ন' বইতে বলেছেন এই তারামণ্ডলীই নাকি রোমক-পারসিক মিথ্র-দেবতার প্রতীক। একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের (এবং অন্যান্য দেশের) দেবদেবীর মূর্তির উৎস নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে এবং এখনও নতুন ভাবনাচিন্তার অবকাশ রয়েছে।

এবার আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ে ফিরে যাওয়া যাক। যদি আকাশের তারার এই মানচিত্রটিই দুর্গার মূর্তির (এবং মহিষাসুর বধের কাহিনির) উৎস হয়, তাহলে আকাশে এই বৃষসংহারের 'ঘটনা'র সময়টাও ভাল করে খতিয়ে দেখা উচিত। হার্টনারের হিসেব মতে প্রায় ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বৃষরাশির 'মৃত্যু' ঘটত শীতের পর যখন দিনরাত্রি একই দৈর্ঘ্যের হত, অর্থাৎ বসন্তে।

এবারে একটা কথা ভেবে চমক লাগে। প্রাচীন কালে দুর্গাপুজো শরতে হত না। বাসন্তী পুজোই হল এর প্রাচীন রূপ। এবং সেই পুজোয় ব্যবহৃত মূর্তি হল একই। তাহলে সেই সময়কার বসন্তকালে আকাশে তারার মানচিত্র এবং বাসন্তীপুজোর মূর্তির মধ্যে একটা যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে কি আকাশের এই বৃষসংহারের ঘটনাই ছিল প্রাচীন ভারতে বাসন্তী পুজোর উৎস?

যদি এই যোগাযোগ ভিত্তিহীন না হয়, তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, এই সূত্র ধরে কি অকালবোধনেরও কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে? বছরের বিভিন্ন সময় আকাশে তারাদের অবস্থান নিয়ে একটু ভাবলে আমরা দেখব যে, আকাশে বৃষসংহারের দৃশ্য বসন্তে নয়, বছরের আরও একটি সময়ও দেখা যায়। তবে সেটা সন্ধ্যাকাশে নয়, শেষরাত্রির আকাশে, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগের মুহূর্তে।

আগে আমরা বৃষ তারামণ্ডলীকে শেষবারের মতো সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে দেখেছিলাম (যাকে বলে Heliacal setting)। বছরে আরও একটি দিন আসে যখন বৃষরাশিকে শেষবারের মতো সূর্যোদয়ের আগের মুহূর্তে পশ্চিম আকাশে দেখা যায়। সন্ধ্যাকাশে নয়, রাত্রিশেষের মুহূর্তে। এমন একটি দিন রয়েছে যেদিন সূর্যোদয়ের আগে তাকে শেষবারের মতো দেখা যায়। শেষবারের মতো, কারণ এর পরদিন তারামণ্ডলীটি কিছুক্ষণ আগেই অস্ত যাবে। সূর্যোদয়ের ঠিক আগের মুহূর্তে নয়। তাই দেখা যাচ্ছে বছরে এমন একটি দিন রয়েছে যেদিন সূর্যোদয়ের আগের মুহূর্তে আকাশে 'বৃষসংহার' হবে। অর্থাৎ শেষবারের মতো একে রাত্রিশেষের আকাশে পশ্চিম দিগন্তে দেখা যাবে (একে বলে Acronychal setting)।

বছরের কোন সময়টিতে বৃষসংহারের এই পুনরাবৃত্তি হয়? খ্রিস্টের জন্মের কয়েকশো বছর আগে এই দ্বিতীয় ঘটনা ঘটত শরতে। ইতিহাসবিদদের মতে প্রায় ৭০০-৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষিকাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর শরতেই এখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শস্য বপনের পালা। নানান ধরনের ধানের মধ্যে শরতে বপন করা ধানের কদর অনেক বেশি। তাই অনুমান করা যায় একসময় বছরের এই অংশটিকে বসন্তের শস্যবপনের সময়ের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয়েছিল। এবং তখন হয়তো বসন্ত কালের চেয়ে শরতের এই দিনগুলিকেই উৎসব-পার্বণের উপযুক্ত সময় ভাবা হয়েছিল। হয়ত এও ভাবা হয়েছিল যে যেহেতু ঠিক এই সময় আকাশে আবার বৃষসংহারের ছবি দেখা যাচ্ছে, তাই একই মূর্তি ব্যবহার করেই দেবীর পুজো করা যাবে। শুরু হয়েছিল 'অকালবোধন'। আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি এইভাবে ভাবলে অকালবোধনের একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।

তবে পৃথিবীর অক্ষরেখার যে-গতির কথা আমরা আগে জেনেছি, তার জন্য এই দ্বিতীয় ঘটনাটি আজকাল আর শরতে হয় না। এখন সূর্যোদয়ের আগের মুহূর্তে বৃষরাশিকে অস্তমুখী দেখতে হলে হেমন্ত (নভেম্বরের শেষ) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

দুর্গার মূর্তিকে এভাবে আকাশের তারামণ্ডলীর মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তাই কিছু কিছু জিনিস খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। যেমন দুর্গার সিংহের ওপরে চড়ে মহিষাসুর বধের দৃশ্য। আর কেনই বা এই মূর্তিকে প্রথমে বসন্ত কালে পরে শরৎ কালে পুজো করা শুরু হল।

তবে এটাও ঠিক যে, দুর্গা মূর্তির সঙ্গে জড়িত সবকিছুর ব্যাখ্যা খুঁজতে আকাশের তারার দিকে তাকানো খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। দুর্গামূর্তির বিবর্তনের মধ্যে মানুষের জীবনের অনেক দিক জড়িয়ে আছে। শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে এই মূর্তির সবকিছু ব্যাখ্যা করতে যাওয়া হবে দানিকেনের মতো পৃথিবীর যাবতীয় রহস্যময় জিনিসের সঙ্গে মহাকাশচারী দেবতাকে জুড়ে দেওয়া, বা সব ধরনের মনোরোগের সঙ্গে ফ্রয়েডের যৌনপ্রসঙ্গ টেনে আনার মতো ব্যাপার।

তবে আকাশের তারার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দুর্গাপুজোর অন্তত কয়েকটা দিক আমরা নতুন ভাবে বুঝতে পারি বলে মনে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি পণ্ডিত শার্ল ফ্রাঁসোয়া দ্যুপ্যুই (Charles François Dupuis)-এর একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে : 'মিথোলজি ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ সায়েন্স; সায়েন্স অ্যালোন উইল এক্সপ্লেইন ইট'। হয়তো কথাটি নেহাত ফেলনা নয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : পলাশ বরন পাল, জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকর ও বিনোদবিহারী নাথ।

বিমান নাথ জ্যোতিঃপদার্থবিদ, বাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে গবেষণারত।

আকাশের তারামণ্ডলীর মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তাই কিছু কিছু জিনিস খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। যেমন দুর্গার সিংহের ওপরে চড়ে মহিষাসুর বধের দৃশ্য। আর কেনই বা এই মূর্তিকে প্রথমে বসন্ত কালে পরে শরৎ কালে পুজো করা শুরু হল।